সুন্দরবনের মনসার ভাসান গান
বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মানুষের জীবনের গান

দীপ্ত সরদার

সমগ্র মধ্যযুগকেই এককথায় বলা যেতে পারে মঙ্গলকাব্যের বা মঙ্গল সাহিত্যের যুগ। কারণ এই সময়পর্বে বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত কালপর্বে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক মঙ্গলকাব্যের। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল তো আছেই, তবে বাঙালির জনজীবনে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্যের ছাপ ফেলে 'মনসামঙ্গল'। লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে দেবী মনসা পূজিত হন একদিকে কৌমসমাজে প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসেবে; আর একদিকে ভয়, সংস্কারজাত প্রভাবগুলি সহজে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। সুন্দরবন অঞ্চলে দেবী মনসাও মানুষের জীবনচর্যায়, তাদের সামাজিক, পারিবারিক জীবনে পূজিতা হন বহু স্থানেই। শহরাঞ্চল থেকে গ্রামীণ পরিবেশে সেই পুজোর চল অনেক বেশি লক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে প্রায় ঘরে ঘরেই এই দেবীর পুজো অতি ভক্তিনিষ্ঠা সহকারেই পালন করা হয়। আর এই পুজো উপলক্ষ্যে দেবীর মহিমা বিষয়ক গান করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে দেবী মনসাকে উদ্দেশ্য করে রচিত এই মহিমা কীর্তনের যে মৌখিক রূপটি, সেটি লোকায়ত গ্রামীণ কবিরা মুখে মুখে আজও গেয়ে বেড়ান। তাকে 'মনসার ভাসান' গান বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

এই মনসার ভাসান গান মাটির গান। মূল মনসামঙ্গালের কাহিনিকে একই রেখে লোকায়ত কবিরা তার পরিবেশনাগত ভাবটিকে রূপদান করেছেন নতুন করে যাত্রা এবং পালাগানের আকারে। সেখানে এগুলি মঞ্চে বা আসর পেতে গ্রামীণ খোলা আকাশের নীচে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেন। মনসামঙ্গাল কাব্যের সমস্ত ঘটনার বর্ণনাই যে এখানে বিস্তৃত আকারে উপস্থিত রয়েছে এমন নয়। কবিরা তাঁদের নিজেদের মতো করে অনেক নতুন চরিত্র, ঘটনার প্রবেশও ঘটান এই গান এবং যাত্রাগুলির মধ্যে। তবে সেই চরিত্র, ঘটনা বা গানগুলি অবশ্যই মূল মনসামঙ্গালকাব্যকে উপেক্ষা করে নয়, তার সামঞ্জস্যতা বজায় রেখেই তাঁরা সেই আখ্যানকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেন।

তবে এই গানগুলি মূলত 'Oral Form' আকারেই রয়ে গেছে। বংশ পরম্পরায় বাড়ির ব্যক্তিবর্গরা অভিনয় করতে করতেই একপ্রকার মুখস্থ করে ফেলেছে গানগুলি। মুখে মুখে গাওয়া এই গানগুলি একসঙ্গে সংকলন করে কোনো গ্রন্থ আজও প্রকাশ পায়নি কোথাও। এমনকি আজও গানগলি সংরক্ষণ করা হচ্ছে না কোনো স্থানে। ফলে অনেক পুরোনো শিল্পী,

যাঁরা গত হয়েছেন বা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদের মুখের গাওয়া সেই গানগুলি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে বহুলাংশেই।

মনসার ভাসান গান এক অর্থেই মাটির গান। যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রাণের। তাই এই প্রাণের সঙ্গে যোগ আছে জীবনের, সমাজের। একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের তাদের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন জীবিকার পরিচয় আছে এই গানগুলিতে। আসলে এই আঞ্চলিক গানগুলি তো বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের জীবনের আর এক অঙ্গ। বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকায় এই অসংখ্য মানুষের পরিচয় হাজির করেছেন এই গানগুলির মধ্যে। সে দিক দিয়ে এই অঞ্চলের গায়েনরা একটি পৌরাণিক পালার মধ্যে এমনতর সব মানুষকে তুলে এনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আর সেজন্যই গানগুলি শুধুই গানের মধ্যে থেমে থাকেনি। জীবনের গান হয়ে উঠেছে সাহিত্যের পাতায়। বলাবাহুল্য, গান বা সংলাপ যেগুলি এই আলোচনার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছি সেগুলি প্রত্যেকটি কোনো নির্দিষ্ট হাতে লেখা পালার পাণ্ডুলিপি থেকে আমি গ্রহণ করেছি। কোনো কোনো বিষয়ে এই ভাসান গানের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমন সব মানুষগুলির কাছে থেকেও সাহায্য নিয়ে আলোচনায় তাকে প্রতিস্থাপিত করেছি। আমি সেখান থেকেই সব উদাহরণগুলি তুলে আলোচনা করলাম।

ক.

লখিন্দরের বাসর ঘর নির্মাণের জন্য বিশ্বকর্মার পরিচয় পাই। চাঁদ, লখিন্দরের বিবাহের পর সাঁতালি পর্বতে একটি লৌহ নির্মিত বাসর ঘর নির্মাণের জন্য তার প্রয়োজন পড়ে। এই বিশ্বকর্মা বাসর নির্মাণে পারদর্শী। চাঁদ তাকে এমন একটি বাসর নির্মাণের কথা জানায় যেখানে কোথাও কোনো ছিদ্র যেন না থাকে। কারণ বেহুলা-লখিন্দরের বাসর রাতে মনসা যেন তার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অবশ্য তার আগেই দেবী মনসা বিশ্বকর্মার সঙ্গে দেখা করে তাকে অভিশাপ দিয়ে বাসর ঘরে তার ফণীগণের চলাচলের পথ তৈরি করে নিয়েছিল। বিশ্বকর্মাকে চাঁদ বাসর ঘর বাঁধার আদেশ দিলে প্রথমে সে অস্বীকার করে। তার কারণ অতি স্পষ্টভাবেই এই গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছে বিশ্বকর্মা—

> আমি তা পারবো না হে সওদাগর/কেমন করে বাঁধবো লোহার বাসর ঘর।/আমি তা পারবো না,/সাঁতালি পর্বত উপরে আমি উঠবো কেমনে/ও সওদাগর আমি তাই ভাবি মনে মনে।/আবার পর্বত হতে উল্টে পড়লে/কোমর বাঁচবে না।/আমি তা পারবো না হে সওদাগর/কেমন করে বাঁধবো লোহার বাসর ঘর।[১]

খ.

লখিন্দরের বিবাহের পাত্রী দেখার জন্য ঘটকের কথা জানতে পারি। গ্রামবাংলায় আজও কোনো পাত্র বা পাত্রীর বিবাহের জন্য ঘটক ঠাকুরের ডাক পড়ে। সেই ছবিও আমরা এই গানের মধ্যে দেখতে পাই। লখিন্দরের বিবাহের জন্য পাত্রী দেখতে এই ঘটকের প্রয়োজন হয়। এই ঘটক চরিত্রটি নিছানি নগরের সওদাগরের একমাত্র কন্যা 'সতী বেহুলার' সন্ধান দেয়। বেহুলার বাড়িতেও লখিন্দরের খবর সে জানায়। দুই দিকের পাত্র-পাত্রীর দর্শনের খবর ঘটকই উপস্থাপন করে। উভয়পক্ষের কাছে বিবাহের সমস্ত গানের দল ভাড়া করা, পালকি বাহকদের সংবাদ দিয়ে নিয়ে আসা, এই বিবাহকেন্দ্রিক সমস্ত কাজ সম্পাদন করে এই চরিত্রটি।

তবে এরই মধ্যে এই চরিত্রটি বেশ রসিক। তার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে দর্শকদের কাছে হাস্যরসের সৃজন করা হয়ে থাকে। ঘটক চরিত্রটির পোশাক এবং অঙ্গভঙ্গি বেশ মজার। কথা বলার ঢং দিয়েও সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আসলে একটানা একটি সিরিয়াস ঘটনা দেখতে দেখতে দর্শকরা যেন হাঁপিয়ে ওঠেন। তাই এই রকম দু-একটি চরিত্র এই অঞ্চলের গানগুলিতে লক্ষ করা যায়। ঘটক চরিত্রের কথাবার্তায় স্থানীয় আঞ্চলিক ছাপটিও বেশ স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। এই চরিত্রটির কথা বলার মধ্যে কতটা যে হাসি লুকিয়ে থাকে, একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করছি।

ঘটক : হরিবোল, হরিবোল। লখিন্দর-এর জন্য পাত্রী দেখার শুভকাজে যাত্রা করলাম। পথে কেউ যেন বাধা দেবেন না।

নায়েব : আরে মশাই, ছাতা মাথায় নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছেন কেন? ছাতা ভাঙুন বলছি।

ঘটক : কি মুশকিল। সকাল বেলা সাড়ে সাত গণ্ডা লোক ডেকে এই ছাতার কল তুলেছি, আর আপনি বলছেন কিনা ছাতা ভাঙুন। আমি সেই সাড়ে সাত গণ্ডা লোক কি সঙ্গে এনেছি, যে আপনি বললেই আমি ছাতা ভাঙবো।

নায়েব : আরে মশাই, আপনার ছাতা আমি ভেঙে দিলাম।

ঘটক : আরে মশাই, করলেন কি! আমার 'ওকে' জ্যান্ত ছাতাটা আপনি ছিঁড়ে দিলেন।

নায়েব : মশাই আপনি কি লোক?

ঘটক : কেন, দেখতে পাচ্ছেন না যে আমি একটা মদ্দা লোক।

নায়েব : আরে মশাই, তা বলা হচ্ছে না। আপনি কোন শ্রেণির?

ঘটক : সাবধান মশাই। আমি ওসব 'ছেনি-হাতুড়ি' না। আমি একেবারে নতুন গুড়ের নতুন পাটালি।

নায়েব : আরে মশাই, তা বলা হচ্ছে না, আপনি কি জাত?

ঘটক : সাবধান মশাই, জাত তুলে কথা বলবেন না। জাতিতে আমি কেউটে।

নায়েব : আরে মশাই, তা বলছি না। আপনি কি কাজ করেন?

ঘটক : তাই বলেন। সে কথা তো আগে বললেই হয়। আমি ঘটকালি করে থাকি।[২]

উপরের কথোপকথনটি ঘটক ও নায়ক চরিত্রের মধ্যেকার। চাঁদ ঘটককে তার পুত্রের জন্য নিছানি নগরে পাত্রীর খোঁজে পাঠালে, রাজ্যে ঢোকার পরে রাস্তায় এই নায়েবের সঙ্গে দেখা হয় ঘটকের। সেই সময়ের দুজনের কথোপকথন এটি। পড়লেই আমরা লক্ষ করবো যে, ঘটকের কথা বলার মধ্যে একটা ঠাট্টা, মজা, মশকরা এই ব্যাপারগুলি আছে। তাই হাস্যরসের সৃজনে এই চরিত্রের অবদান এই ভাসান গানের অন্যতম একটি বিষয়ও বটে।

গ.

গানের মধ্যে গণক ঠাকুরের পরিচয় আছে। গ্রামের মানুষ আজও তাদের সংস্কারগুলি থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। তাইতো তারা হাত গণনা, কুষ্টি বিচার, কপাল দেখানো ইত্যাদি বিষয়গুলি আজ সভ্য জগতে কুসংস্কার বলে মনে হলেও, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে গ্রামবাংলায় প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ সেগুলিকে নিজের সংস্কৃতির মধ্যে গ্রহণ করেছিল। তাইতো তারা গণককে দিয়ে গণনা করে তাদের বিভিন্ন ভালো-মন্দ খবরাখবর

নিত। তেমনি একটি চরিত্রের পরিচয় পাই উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার এই মনসার ভাসান গানগুলির মধ্যে। গণক ঠাকুরের খোঁজ করা হয়ে থাকে, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য করতে গিয়ে সে কোথায় আছে তার পরিস্থিতি জানার জন্য, কেমন আছে তার জীবন তা জানার জন্য এবং বাড়ির আরো অন্যান্য খবর জানার জন্য। সেই হেতু রাজ্য থেকে রানিমা অর্থাৎ সনকা গণকঠাকুরকে সংবাদ পাঠায়। সেই সময়ই এই চরিত্রটির সন্ধান মেলে। এই গণক ঠাকুর রানি মায়ের হাত গণনা করে জানায় যে—

গণক : রানি মা, আমাকে কি জন্য ডেকেছেন?

সনকা : দেখুন ঠাকুরমশাই। আমার প্রাণপতি আজ ১২ বছর বাণিজ্যে গমন করেছেন। আপনাকে গনাপড়া করে দেখতে হবে তিনি ভালো আছেন না মন্দ আছেন।

গণক : বুঝতে পেরেছি। আপনার প্রাণপতি আজ ১২ বছর বাণিজ্য গমন করেছেন। তাই আমাকে গনাপড়া করে দেখতে হবে তিনি ভালো আছেন কি মন্দ আছেন।

সনকা : হ্যাঁ, সত্য।

গণক : এখানে বসুন রানিমা। আর আপনার বামহস্ত খানি দিন। আর মনে মনে একটা ফুলের নাম করুন। সোম শনি পূর্বে হবে, বুধ বৃহস্পতি দক্ষিণে হবে, সুখাদি পশ্চিমে মূল, একা মঙ্গলে করেছে নির্মূল। ও রানিমা, আমার মাথার চুলগুলো সব লাফ পাড়াপাড়ি করছে।

সনকা : কি হলো ঠাকুরমশাই

গণক : রানিমা, আপনার দুটি কুমঙ্গল আর একটি সুমঙ্গল।

রানিমা : বলুন ঠাকুরমশাই। আমারে দুটি কুমঙ্গালের কথা আর একটি সুমঙ্গালের কথা।

গণক : তাহলে রানিমা আপনার একটি কুমঙ্গালের কথা হলো আপনার প্রাণপতি বাণিজ্য থেকে ফেরার সময়ে কালীদহের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সনকা : ওহ, ঠাকুরমশাই এ কি কথা শুনালেন আমায়।

গণক : কাঁদবেন না রানিমা। কোন ভয় নেই তিনি অতি কষ্টে কূল পেয়েছেন।

সনকা : কূল পেয়েছেন। তাহলে আমার আর একটি কুমঙ্গালের কথা বলুন।

গণক : তাহলে শুনুন। আপনার রামকদলী বনে একটি চোর ঢুকবে। আপনার বাড়ির রাম সিং জমাদার আছে সে চোরকে বন্দি করবে।

সনকা : ঠাকুর আর আমার সুমঙ্গাল কি বলুন।

গণক : আপনার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সেই পুত্র রবে না, মা বলে ডাকবে না। কিন্তু এই ফুলটি গ্রহণ করুন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।[৩]

আমরা উপরের এই সংলাপগুলি থেকে দেখলাম যে গণকঠাকুর শুধু গণনা মাত্রই করে না। সে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা যে সত্যগুলি তার পরিচয়ও জানায়। এমনকি বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে তার উপায়ও জানিয়ে দেয়। যদিও সেই উপায়গুলি কতটা বাস্তবায়িত হয় তার প্রশ্ন এখানে নয়। মূল কথা হলো বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের দিকগুলি দিয়ে বিচার করলে এই চরিত্রটির এক অন্যরূপ আমাদের কাছে ধরা দেয় ভাসান গানগুলির মধ্যে দিয়ে।

ঘ.

লখিন্দর-বেহুলার বিবাহের সময় পুরোহিতের পরিচয় পাই। পুরোহিত চরিত্রটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই হাস্যরসের অবতারণা। লখিন্দর-বেহুলার বিবাহবন্ধন, তাদের মালাবদল, বিয়ের মন্ত্র ইত্যাদি কাজের জন্য পুরোহিত চরিত্রটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাই। এই জীবিকার মানুষ আজও আমাদের বিবাহের সময়ে পাওয়া যায়। ভাসান গানগুলোতে তার অবস্থান দেখি। এই ভাসান যাত্রায় পুরোহিতের প্রবেশ হয়েছে এমন ভাবে—

> পুরোহিত : মা সকলেরা জয় দিন, নারায়ণ যাচ্ছে নারায়ণ। বাবা তুমি এখানে বসো, মা তুমি এখানে বসো। মন্ত্র বলুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে। বলুন করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগতপথে, গোপেষু গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তুলসী দর্শনে ভাস্করে, শুভক্ষে পূর্ণিমা রাত্রে বিবাহ সম্পূর্ণ হইলো। ঘটক ঠাকুর আমার চাল, কলা গুলো বেঁধে দিন।[৪]

অর্থাৎ, হাসির খোরাকের জন্য একদিকে যেমন চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে; ঠিক তেমনিই আবার চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিতও হয়েছে। এই রকম বিভিন্ন বিত্তজীবি মানুষের পরিচয় এই গানগুলিতে রয়েছে।

ঙ.

জন্মগ্রহণ করার সময় দাইমার পরিচয় পাই। গ্রাম-বাংলার প্রান্তীয় সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে আজও সন্তান-সন্ততি জন্ম গ্রহণের সময় সেখানে এই দাইমাদের আনা হয় সন্তান প্রসব করানোর জন্য। এই অঞ্চলের মানুষ প্রসবের সময়ে কাছাকাছি উপযুক্ত ডাক্তার না পেলেও প্রত্যেক গ্রামে কমবেশি এইরকম দাইমা মহিলাদের সন্ধান মেলে। এনারা অল্পবিস্তর ডাক্তারিবিদ্যা জানেন। তার সাহায্যেই সন্তান প্রসবের সময় তাদের সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই তারা এই কর্মটি নিজের জীবনের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছেন। পারিশ্রমিক হিসেবে এনারা ডাক্তারের মতো কোনো অর্থ নেন না। তবে উপহারস্বরূপ শাড়ি, কাঁসার থালা এবং খাওয়া-দাওয়া তারা পান। সেইরকম এই দাইমার ডাক পড়েছিল চাঁদের বাড়িতে লখিন্দরের জন্মগ্রহণের সময়। এই দাইমার দ্বারাই লখিন্দরের প্রসব করানো হয়। গানের মধ্যে তাই দেখানো হয়, এই চরিত্রটিকে সাধারণত সন্তান হওয়ার পরে নাড়িছেদন অংশে। এটিও তার কর্মের মধ্যে অন্যতম। সেই সময় ডাক্তারি যন্ত্রপাতি না পেলেও সে জল, সুতো, ব্লেড, ছাই ইত্যাদির সাহায্যে এই কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। ভাসান যাত্রার মধ্যে সেই অংশটির বর্ণনা এমনভাবেই করা আছে—

> সনকা : দাসী, দাইমাকে এক্ষুনি আনার ব্যবস্থা করো।
>
> দাসী : ঠিক আছে রানিমা। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।
>
> (দাইমার প্রবেশ ও গান)
>
> দাইমা দাইমা বলে ডাকলো আমায় কে/অতি আরামে শুয়ে ছিলাম খাট পালঙ্কে।/দাইমা দাইমা বলে ডাকলো আমায় কে,/অতি আনন্দে শুয়ে ছিলাম নলবাগানে।/দাইমা দাইমা বলে ডাকলো আমাকে/অতি আনন্দে শুয়ে ছিলাম নাড়াবাগানে।
>
> দাসী : আমাদের একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। তাই তোমাকে নাড়িছেদন করতে হবে।
>
> দাইমা : তাহলে তুই আমার নাড়িছেদনের জিনিসগুলো এনে দে।[৫]

এরপরেই এই জিনিসপত্র দিয়ে সে পুত্রের নাড়িছেদন করে। এজন্য সনকার কাছ থেকে নতুন

বস্ত্রাদি ও দশ কেজি চাল গ্রহণ করে। এই অংশটিতে অভিনয়ের সময় মূলমঞ্চে একটি ছোট্ট শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে এবং সে কান্নাকাটি করে। বিষয়টি অতি চমৎকার ভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

চ.

ভাসান গানগুলির মধ্যে আমরা হদিস পাই ওঝা চরিত্রের। গ্রামে-গঞ্জে আজও কিছু কিছু অঞ্চলে মানুষ এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। কোনো মানুষকে সাপে কামড়ানোর পরে অসহায় হয়ে যায় গ্রামীণ এই চব্বিশ পরগনার মানুষগুলি। তাদের গ্রামে কোনো ডাক্তার না পেয়ে হাজির হয় ওঝার কাছে। এই ওঝারা সাপের বিষ ঝাড়িয়ে মানুষকে সুস্থ করে তোলেন। তেমনই এই মনসার ভাসান গানের মধ্যে পরিচয় পাই বিনোদ ওঝার। লখিন্দরের বাসর রাতে সাপে কামড়ানোর পরে বেহুলা এই বিনোদ ওঝাকে নিয়ে আসে। বিনোদ ওঝার গানটিও আছে যাত্রাগুলিতে—"ওরে আর কাঁদিস না আর কাঁদিস না/বেহুলা সুন্দরী হায়রে বেহুলা সুন্দরী।/আমি ওঝা বিনোদ খোঁড়া যাচ্ছি তোদের বাড়িতে,/আমার এই বিনোদের বড়ি যে রোগীতে খায়/সেই মানুষ যে হেঁটে চলে যায়।/ওরে আর কাঁদিস না আর কাঁদিস না।"[৬]

এই বিনোদ ওঝা বেহুলার অনেক প্রার্থনাতে লখিন্দরের দেহ পরীক্ষা করে তাকে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ান, গাছ খাওয়ানো ইত্যাদির পরেও তার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারেনি। বিনোদ জানায়, তার স্বামীকে কালসাপে দংশন করেছে। তাই সে বাঁচাতে পারবে না। তবে বেহুলা যদি কলার মান্দাস করে তার মৃত স্বামীকে নিয়ে দেবপুরে যায়, তবেই স্বামীকে বাঁচাতে পারে। তাই এই গানগুলোর মধ্যে ওঝা বৃত্তিধারী মানুষেরও পরিচয় আমরা পাই।

ছ.

ভাসান গানগুলির মধ্যে পাই কুমোর জীবিকাধারী মানুষের পরিচয়। বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ে ঠিক হলে বিয়ের অন্যতম শর্তস্বরূপ চাঁদবেনে বেহুলার কাছে কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরাতে রন্ধনের কথা জানায়। সেই কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরা তৈরি করার সময় বেহুলার পিতা সায়বেনে সওদাগর তার রাজ্যে সংবাদ পাঠায়। এই কুমোর হলেন ছিদাম পাল। ছিদাম ও তার স্ত্রী দুজনেই মাটির হাঁড়ি, কলসি বানায়। প্রথমে ছিদাম পাল বর্ষাকালের দিনে এই জিনিস দুটি বানাতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু তারপরে—

সায়মন : হ্যাঁ, শোনো। ছিদাম পাল আমি তোমাকে ডেকেছি একখানি কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরা তৈরি করে দেওয়ার জন্যে।

ছিদাম : দেখুন সওদাগর মশাই, আমি আপনার কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরা তৈরি করে দিতে পারবো না। কারণ এই আষাঢ় মাসের দিনে আমাদের চাক ঘোরাতে নেই।

সায়মন : সাবধান, ছিদাম পাল। কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা সরা তোমাকে তৈরি করে দিতেই হবে। নইলে কি করবো জানো—

ছিদাম : কি করবেন সওদাগরমশাই?

সায়মন : এই রাত প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দেবো। এই নাও দুইশত টাকা। এখন আমি আসি।

ছিদাম : তাই তো বায়না তো নিলাম আমি। এখন কি যে করি।[৭]

অতএব দেখা যায় যে, ছিদাম পাল বর্ষাকালে তার চাকা ঘোরাতে রাজি হলেও সায়বেনের বলা রাজ্য ছাড়া হওয়ার ভয়ে তাকে সেই বায়না নিতে হয় হাঁড়ি, সরা তৈরি করার জন্য। এখানে এই কুমোর বৃত্তিধারী চরিত্রটিকে দেখি তার পরিচয় ভাসান গানগুলিতে উঠে এসেছে।

উপরিউক্ত যে জীবিকাসম্পন্ন মানুষের কথা আলোচনা করলাম তাছাড়াও আরও কিছু মানুষের পরিচয় সন্ধান পাওয়া যায় মনসার ভাসানগান বা ভাসান যাত্রাগুলির মধ্যে। লখিন্দর-বেহুলার বিয়ের যৌতুক নেওয়ার সময়ে 'স্বর্ণকার' চরিত্রটিকে পাওয়া যায়। লখিন্দরের সৃষ্টি করা মায়াবাজার পরিষ্কার করার সময়ে 'ঝাড়ুদার' চরিত্রের খোঁজ পাওয়া যায়। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য করতে যাওয়ার কালে মাঝি-মাল্লাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই সমস্ত চরিত্রগুলির অভিনয়ের অংশ অত্যন্ত সামান্য। ভাসান গানগুলিতে প্রয়োজন মতো চরিত্রগুলি হাজির হয়ে তাদের অবস্থান জানান দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা অভিনয় শেষ করে। খুব বেশি কথোপকথন চরিত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে একথা মানতেই হবে যে, মনসার ভাসানগান ও যাত্রাগুলি শুধুমাত্র গান আকারে আমাদের কাছে থেমে থাকে না। উপরন্তু গানগুলি হয়ে ওঠে অনেক সময় গ্রামীণ খেটে খাওয়া একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার গান। আর সেখানেই ভাসান গানগুলি শুধুমাত্র সাহিত্যের পাতাতেই আবদ্ধ থাকে না, সেগুলি সমাজের বহুমাত্রিকতায় ধরা দেয়।

মনসার ভাসান গানগুলি আজও প্রাসঙ্গিক মানুষের জীবনের সঙ্গে। আসলে এই গান মানুষের জীবনের গান। তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে বহন করে ভবিষ্যতে নিয়ে যাওয়ার গান। তবে আজ খুবই দুঃখের কথা, গানগুলি হারিয়ে যাচ্ছে সংগ্রহের অভাবে। জানি না, অদূর ভবিষ্যতে এগুলোর অস্তিত্ব আর কতটা থাকবে। কবিরা, গায়েনরা আর এমন পালাগান লিখবেন কিনা, তাও ভাবনার প্রয়োজন আছে। কেননা, যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে এই মানুষেরা এই ভাসান গান করেন; সেখানে দাঁড়িয়ে আর্থিক সংকটে থাকা মানুষ, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে অনেক সময় চূড়ান্ত অর্থাভাবে থাকায় তাঁরা ভাসান গান থেকে সরে আসেন।

উৎসের সন্ধানে

১. হাতে লেখা পালার পাণ্ডুলিপি (অগ্রন্থিত), পালার নাম — 'চাঁদের দর্প চূর্ণ', রচনা ও নির্দেশনা —শ্রী নির্মল কুমার মণ্ডল, দল ম্যানেজার—নির্মল মিস্ত্রী, ঠিকানা—যোগেশগঞ্জ, হেমনগর কোষ্টাল থানা, উত্তর ২৪ পরগনা, পৃ. ৪২

২. তদেব : পৃ. ৮৫

৩. তদেব : পৃ. ৪১

৪. তদেব : পৃ. ১২০

৫. তদেব : পৃ. ৪৩

৬. হাতে লেখা পালার পাণ্ডুলিপি (অগ্রন্থিত), পালার নাম—'মনসা মায়ের বিদ্রোহী সন্তান', রচনা ও নির্দেশনা—শ্রী তুষার কান্তি মণ্ডল, দল ম্যানেজার—শ্রী পরিতোষ সরকার, ঠিকানা—মিলন সংঘ, বসিরহাট মহাকুমা, উত্তর ২৪ পরগনা, পৃ. ১৩১

৭. তদেব : পৃ. ৯৩